icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

# স্বাস্থ্য সংলাপ

ISSN 1021-2078

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ১৬ ■ সংখ্যা ২ ■ অগ্রহায়ণ ১৪১৪

## টনসিলাইটিস

**ফারহানাজ রহমান**
আইসিডিডিআর,বি

আমাদের গলার ভেতরের অংশ ফ্যারিংস-এ যে টনসিল থাকে তার প্রদাহকেই মূলত টনসিলাইটিস বলা হয়। এই প্রদাহ গলার অন্যান্য টনসিলকেও আক্রান্ত করতে পারে, যেমন অ্যাডেনোয়েড এবং লিংগুয়্যাল টনসিল (টনসিল টিস্যুর যে-অংশ জিহ্বার পেছনে থাকে)।

মারাত্মক টনসিলাইটিস-আক্রান্ত রোগীর টনসিলের অবস্থা

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং ইমিউনোলজিক্যাল ফ্যাক্টর টনসিলাইটিস-এর জন্য দায়ী। ভাইরাসগুলো হলো হারপিস সিমপ্লেক্স, এপ্স্টিন-বার ভাইরাস, সাইটোমেগালো ভাইরাস, এ্যাডেনো ভাইরাস ও মিসেলস। শতকরা ১৫-৩০ ভাগ রোগী ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণে টনসিলাইটিস-এ আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে স্ট্রেপটোকক্কাস দ্বারা বেশিরভাগ লোক আক্রান্ত হয়।

টনসিলাইটিস সাধারণত ২ বছরের অধিক বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। এর মধ্যে ৫-১৫ বছরের শিশুদের টনসিলাইটিস-এর জন্য স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া দায়ী এবং ৫ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ভাইরাল টনসিলাইটিস বেশি হতে দেখা যায়।

### টনসিলাইটিস-এর প্রকারভেদ এবং লক্ষণ

মারাত্মক টনসিলাইটিস রোগীর জ্বর, গলাব্যথা ও নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ থাকে এবং খাবার গ্রহণে কষ্ট হয়। গলার লিম্ফ গ্রন্থিগুলো ফুলে যায় এবং ব্যথা করে। অনেক সময় টনসিল ফুলে গিয়ে শ্বাসনালীতে বাধা সৃষ্টি করলে রোগীর মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হয়, রাতে ঘুমের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই সমস্যাগুলো তিন থেকে ৫ দিনের মধ্যে সাধারণত চলে যায়, কিন্তু অনেক সময় চিকিৎসা ছাড়া দুই সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

*ফিরে ফিরে-আসা টনসিলাইটিস*: যখন কোনো রোগী বছরে কয়েকবার মারাত্মক টনসিলাইটিস-এ আক্রান্ত হয় তখন আমরা তাকে রেকারেন্ট (ফিরে ফিরে-আসা) টনসিলাইটিস বলে থাকি।

*ক্রনিক টনসিলাইটিস*: এসব রোগীর অনেকদিন ধরেই গলাব্যথা, মুখে দুর্গন্ধ এবং স্থায়ীভাবে লিম্ফ গ্রন্থিগুলোতে ব্যথা থেকে যায়।

*পেরিটনসিলার অ্যাবসেস*: এসব রোগীর তীব্র গলাব্যথা, জ্বর, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখ খুলতে কষ্ট অনুভব, গলার স্বর বসে-যাওয়া, ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

টনসিলাইটিস রোগীর শারীরিক পরীক্ষা করে যেসব পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে সেগুলো হলো:

- জ্বর, টনসিল ফুলে লাল হয়ে-যাওয়া, পুঁজ জমে-থাকা
- অনেক সময় মুখের ভেতরে তালুতে কিছু রক্তক্ষরণের চিহ্ন পিন-এর আকারে দেখা যায়, গলার লিম্ফ গ্রন্থিগুলো ফুলে যায়
- রোগীকে মুখ খুলে শ্বাস নিতে হয়; গলার স্বর চিকন হয়ে আসে
- পেরিটনসিলার অ্যাবসেস-এর ক্ষেত্রে টনসিলের উপরের অংশ এবং চারপাশ ফুলে থাকে। এক্ষেত্রে চোয়াল নাড়াতে কষ্ট হয়

### টনসিলাইটিস-এর চিকিৎসা

মারাত্মক টনসিলাইটিস-এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জীবাণু-নাশক অষুধ (অ্যান্টিবায়োটিক) দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। এক্ষেত্রে রোগীকে জ্বর ও ব্যথার অষুধও দিতে হবে। প্রচুর পানি খেতে বলতে হবে। দিনে ২/৩ বার গরম পানিতে লবণ দিয়ে কুলকুচি করতে হবে। মুখের ভিতরের অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে

ক্রনিক এবং রেকারেন্ট টনসিলাইটিস-এর ক্ষেত্রে সাধারণত অপারেশনের পরামর্শ দেওয়া হয়। টনসিলাইটিস-এর জন্য শ্বাসনালীতে বাধা সৃষ্টি হলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। ■

### ভেতরের পাতায়

প্রোস্টেট ক্যান্সার: চিকিৎসা-ভাবনা ২

বন্যাজনিত রোগব্যাধি থেকে
পরিত্রাণের উপায় ৪

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, এইচআইভি/এইডস্, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক কর্মকাঠামোও আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিস্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

## স্বাস্থ্য সংলাপ

**সম্পাদনা পরিষদ**

| | |
|---|---|
| প্রধান সম্পাদক | আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো |
| উপ-প্রধান সম্পাদক | প্রদীপ কুমার বর্ধন |
| ব্যবস্থাপনা সম্পাদক | এম শামসুল ইসলাম খান |
| সম্পাদক | এম এ রহিম |
| পৃষ্ঠাবিন্যাস | সৈয়দ হাসিবুল হাসান |
| কম্পোজ | হামিদা আক্তার |

**সদস্য**

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান, রুবহানা রকিব ও পিটার থর্প।

**কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন**

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বরাবর ইংরেজিতে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

**প্রকাশক**
আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

**মুদ্রণ: সেবা প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ফোন: ৯১১১৪৩৩**

# প্রোস্টেট ক্যান্সার: চিকিৎসা-ভাবনা

**কাজী রফিকুল আবেদীন**
**ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেজ অ্যান্ড ইউরোলজি**
**আনোয়ারুল ইকবাল**
**আইসিডিডিআর,বি**

*[স্বাস্থ্য সংলাপ-এর চৈত্র ১৪১৩ সংখ্যায় প্রোস্টেট ক্যান্সারের ওপর আমাদের একটি বিশ্লেষণধর্মী লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো। তবে চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্য ছিলো অপ্রতুল। এ-লেখাটি প্রোস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসা-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রদানের নিমিত্তেই রচিত হয়েছে]*

বর্তমানে প্রোস্টেট ক্যান্সারের অত্যন্ত ভালো চিকিৎসা রয়েছে। প্রোস্টেট ক্যান্সারের রয়েছে নানাবিধ চিকিৎসা-পদ্ধতি। এসব চিকিৎসা-পদ্ধতির সঠিক নির্বাচন ও যথাসময়ে প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব।

প্রোস্টেট ক্যান্সার-এর চিকিৎসার সফলতা নির্ভর করে কিছু বিষয়ের ওপর। প্রথম যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে: প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়। রোগের উপসর্গ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে বা নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে যদি প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা দেওয়া যায়, তবে চিকিৎসা থেকে সর্বোৎকৃষ্ট ফল লাভ সম্ভব।

প্রোস্টেট ক্যান্সার সনাক্তকরণের সাথে সাথে আপনার চিকিৎসকের দায়িত্ব হবে এ-রোগ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করা। এগুলো নিম্নরূপ:

- প্রোস্টেট ক্যান্সারের বিস্তৃতি আপনার শরীরে কতদূর হয়েছে বিভিন্ন স্ক্যানিং-এর মাধ্যমে তা নির্ণয় করা যায়
- প্রোস্টেট ক্যান্সার আপনার শরীরের প্রতি কতটা আক্রমণাত্মক তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে সব প্রোস্টেট ক্যান্সারই সমানভাবে আক্রমণাত্মক নয়। কোনো কোনো প্রোস্টেট ক্যান্সার-এর ক্ষেত্রে ক্যান্সার-কোষ অতি ধীরে ধীরে আপনার শরীরকে আক্রমণ করে বা ক্ষতিগ্রস্থ করে। আবার কোনো কোনো প্রোস্টেট ক্যান্সার খুবই আক্রমণাত্মক (aggressive) হয়ে থাকে যা অতি দ্রুত শরীরকে আক্রমণ করে থাকে। প্রোস্টেট ক্যান্সার-এর কোষের এই প্রকৃতি সম্পর্কে প্রোস্টেট বায়োপসি-র ফলাফল বা হিস্টোপ্যাথলজি রিপোর্ট থেকে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব
- জানা থাকতে হবে প্রোস্টেট বায়োপসি-তে কতভাগ প্রোস্টেট-কলা (tissue) ক্যান্সার-আক্রান্ত পাওয়া গেলো। এর সঙ্গে জানতে হবে মূল ক্যান্সার/টিউমার-এর পরিমাণ (tumour volume) কত
- আপনার বয়সকে বিবেচনায় রাখতে হবে
- আপনার অন্যান্য স্বাস্থ্যসমস্যা, যেমন বহুমূত্র, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ বা অন্য কোনো রোগ আছে কি না কিংবা অতীতে ছিলো কি না, অর্থাৎ আপনার স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা নেওয়া প্রয়োজন

মানবদেহে প্রোস্টেট গ্রন্থির অবস্থান (ছবি: ইন্টারনেট)

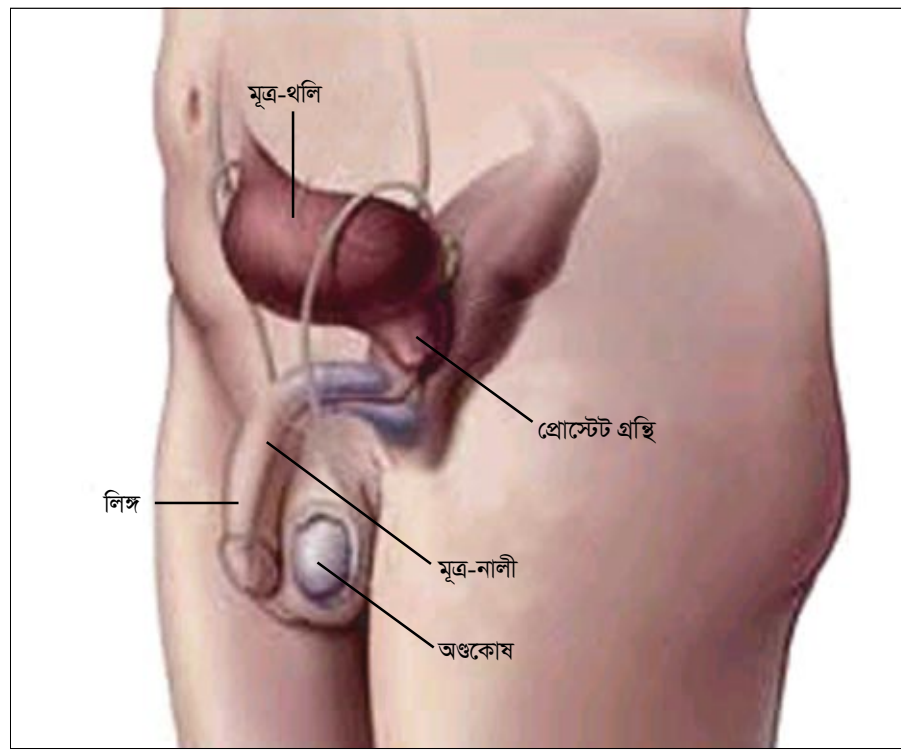

এসকল বিষয় জেনে নিয়ে আপনার চিকিৎসক আপনার সাথে বা আপনার পরিবারের নিকট-সদস্যদের সাথে চিকিৎসা-পদ্ধতি নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং চিকিৎসক তার নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করবেন। চিকিৎসা-পদ্ধতি নির্ধারণে মূল অসুস্থতার বাইরেও বিবেচনায় রাখতে হবে: চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীর জীবন-যাপনের গুণগত মান (quality of life), যৌনজীবন এবং চিকিৎসার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে। চিকিৎসার খরচও আরেকটি বিবেচনার বিষয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রোস্টেট ক্যান্সার-এর বিস্তৃতি খুবই ধীর গতিসম্পন্ন এবং ক্যান্সার-কোষগুলো স্বল্প বা মাঝারি মাত্রায় আক্রমণাত্মক বিধায় শতকরা ৬০-৭০ ভাগ রোগীই সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ১৫-২০ বছর প্রায় সুস্থ অবস্থায় থেকে স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করতে পারেন।

বর্তমানে যেসব পদ্ধতি এ-রোগের চিকিৎসায় ইউরোপ-আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রায় সবগুলোই গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ সফলতার সাথে প্রয়োগ করে আসছেন। এসব পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে: শল্যচিকিৎসা, বিকিরণ-রশ্মি প্রয়োগ (রেডিওথেরাপি), হরমোন-চিকিৎসা, ইত্যাদি।

## প্রোস্টেট ক্যান্সারে শৈল্যচিকিৎসা

যদি প্রোস্টেট ক্যান্সার প্রোস্টেট-গ্রন্থির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে ক্যান্সারের প্রকৃতি, রোগীর বয়স ও সার্বিক শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে শল্যচিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এ-ক্ষেত্রে যে শল্যচিকিৎসা বা অপারেশন করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে radical prostatectomy, অর্থাৎ রোগীর প্রোস্টেট-গ্রন্থিতে ক্যান্সার-এর উৎস সম্পূর্ণভাবে শরীর থেকে সরিয়ে ফেলা।

এ-অপারেশন সাধারণত নিরাপদ। পেটের নিচের অংশে ছোট্ট অস্ত্রোপচার (incision)-এর মাধ্যমে এ-অপারেশন করা হয়। না-কেটে ছোট ছিদ্র করে যন্ত্রের সাহায্যেও (laperoscopic) অপারেশন করা যায়। আজকাল যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং এশিয়া মহাদেশের সিংগাপুর এবং মালয়েশিয়াতেও রোবোট-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এধরনের অপারেশন করা হচ্ছে।

যদিও এ-অপারেশন সাধারণত নিরাপদ, প্রোস্টেট ক্যান্সারের শৈল্যচিকিৎসায় কিছু কিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটির কথা নিচে উল্লেখ করা হলো:

- অপারেশনের পর যৌন অক্ষমতা সৃষ্টি হতে পারে। শতকরা ৫০-৬০ ভাগ রোগী অপারেশন-পরবর্তীকালে এ-সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। স্নায়ু-সংরক্ষণ শল্যপদ্ধতি (nerve-staring surgery) প্রয়োগ করে এই পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব। অপারেশনজনিত কারণে যে যৌন অক্ষমতা সৃষ্টি হয় তা প্রচলিত যৌন অক্ষমতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত অষুধের মাধ্যমে প্রায় সব রোগীরই চিকিৎসা করা সম্ভব।
- অপারেশনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রস্রাব ধরে রাখতে যে শারীরিক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি রয়েছে সেটি সাময়িকভাবে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রস্রাব ধরে রাখতে যে-সমস্যার সৃষ্টি হয় বা প্রস্রাব অনিয়ন্ত্রিতভাবে পড়ে যাবার যে-সমস্যার সৃষ্টি হয় তা সাধারণত সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়: অপারেশন-পরবর্তী সময়ে শতকরা ১০ ভাগ রোগী এধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তবে অপারেশন-পরবর্তী ৬-৯ মাস সময়ে এধরনের রোগীদের শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান, অর্থাৎ প্রস্রাব ধরে রাখার স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ফিরে পান। মোট অপারেশনের শতকরা ১ ভাগ বা তারও কমসংখ্যক রোগী স্থায়ীভাবে এধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। এই স্বল্পসংখ্যক রোগীর জন্যও এখন যথাযথ চিকিৎসা-ব্যবস্থা রয়েছে। স্থায়ীভাবে যেসব রোগী প্রস্রাব ধরে রাখার ক্ষমতা হারান, তাদের জন্য কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি (artificial sphincter) এবং sling-পদ্ধতি সংযোজনের মতো উন্নত চিকিৎসা এখন করা সম্ভব। অন্যদিকে, রেডিক্যাল প্রোস্টেক্টোমি (radical prostatectomy) সঠিক সময়ে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা গেলে তা থেকে সফলতা লাভের সম্ভাবনা হচ্ছে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ। এসব রোগী অপারেশন-পরবর্তী সময়ে ক্যান্সারমুক্ত জীবন যাপন করেন।

## প্রোস্টেট ক্যান্সার চিকিৎসায় রেডিওথেরাপি

অন্য অনেক ক্যান্সারের মতো প্রোস্টেট ক্যান্সার চিকিৎসায় বিকিরণ-রশ্মি প্রয়োগ বা রেডিওথেরাপি একটি স্বীকৃতভাবে সফল পদ্ধতি। বর্তমানে আমাদের দেশে উন্নত হাসপাতালে রেডিয়েশন অনকোলজি বিভাগ অত্যন্ত আধুনিক চিকিৎসাসেবা প্রদান করে থাকে। এজন্য বাংলাদেশে বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন যাদের তত্ত্বাবধানে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

প্রোস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে রোগের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে রেডিয়েশন থেরাপি দেওয়া হয়ে থাকে এবং এ-চিকিৎসায় রোগী উপকৃত হন। বিষয়টি হচ্ছে: রোগীর চিকিৎসককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কখন এবং কোন রোগীর জন্য এ-পদ্ধতি গ্রহণের কথা বিবেচনা করবেন।

বিদেশের একটি হাসপাতালে প্রোস্টেট ক্যান্সার-আক্রান্ত রোগীকে রেডিওথেরাপি দেওয়া হচ্ছে (ছবি: ইন্টারনেট)

## প্রোস্টেট ক্যান্সারের জন্যে হরমোন চিকিৎসা

সাধারণভাবে বলা যায়: প্রোস্টেট ক্যান্সার-এর কোষগুলো পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরন (testosterone)-এর ওপর নির্ভরশীল। যদিও প্রোস্টেট ক্যান্সারে তিন রকমের ক্যান্সার-কোষ

থাকে, একধরনের কোষ পুরুষ হরমোনের ওপর নির্ভরশীল। একধরনের কোষ পুরুষ হরমোনের প্রতি সংবেদনশীল (hormone-sensitive) আর অন্যগুলো পুরুষ হরমোনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী (hormone-resistant)। তবে এটা নিশ্চিত যে, প্রোস্টেট ক্যান্সার-এর বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি পুরুষ হরমোনের ওপর নির্ভরশীল। প্রোস্টেট ক্যান্সার তার জীবনকালের একটা পর্যায়ে টেস্টোস্টেরন হরমোন-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধী হয়ে ওঠে কিংবা প্রথম থেকেই অবস্থানকারী টেস্টোস্টেরন হরমোন-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধী কোষগুলো রোগের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিয়ে নেয়। যেহেতু এ-ক্যান্সার কোষগুলো হরমোন-এর ওপর নির্ভরশীল, বিশেষ অষুধ প্রয়োগ বা শৈল্যচিকিৎসার মাধ্যমে শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোন-এর পরিমাণ কমিয়ে বা শরীরকে টেস্টোস্টেরনশূন্য করে এবং এ-হরমোনের কার্যকারিতা রোধ করে প্রোস্টেট ক্যান্সারের সাময়িক চিকিৎসা করা সম্ভব। সাময়িকভাবে হলেও এ-পদ্ধতিতে ক্যান্সার-কোষের বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি রোধ করা সম্ভব। বিশেষ অষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে এটি করা সম্ভব অথবা শৈল্যচিকিৎসার দ্বারা হরমোন তৈরির উৎস অপসারণের মাধ্যমেও তা করা সম্ভব। বাংলাদেশে এখন এ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত সকল আধুনিক অষুধ পাওয়া যাচ্ছে এবং মূত্র বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ দক্ষতার সাথে তা এ-রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করছেন। জেনে রাখা ভালো: প্রোস্টেট ক্যান্সার-এর চিকিৎসায় হরমোন সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণীত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় না। যদি অসুখ বেশ খানিকটা বিস্তৃত হয়ে যায় (বা অন্য পদ্ধতি ব্যবহার শারীরিক কারণে করা না-যায়, তবেই এ-পদ্ধতি বিবেচনায় আনা হয়, কারণ হরমোন চিকিৎসায় রয়েছে বেশকিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। বিশেষত এসব পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কাজ করে আমাদের শরীরের অস্থি বা হাড়ের ওপর এবং যৌনক্ষমতা আর মানসিক অবস্থার ওপর।

অন্যদিকে, প্রোস্টেট ক্যান্সার-এর বিস্তৃতির একটা পর্যায়ে ক্যান্সার-কোষগুলো হরমোন চিকিৎসার বিরুদ্ধে প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। এ-পর্যায়টি আসে রোগের অত্যন্ত পরিণত অবস্থায় এবং তখন কেমোথেরাপির ব্যবস্থা করা হয়। এ-অবস্থায় কেমোথেরাপি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভালো কাজ করে, যদিও সব ক্ষেত্রে উপকারিতা সমানভাবে পাওয়া যায় না। আবার, চিকিৎসার উন্নতি বা স্থিত অবস্থা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয় না।

প্রোস্টেট ক্যান্সার-এর চিকিৎসা নিয়ে সারা পৃথিবীতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। চিকিৎসা-পদ্ধতি নির্বাচন, কখন চিকিৎসা শুরু করা উচিত, কখন চিকিৎসা শুরু করতে অপেক্ষা করা প্রয়োজন, এখনই বড় ধরনের চিকিৎসা শুরু করা হবে কি হবে না, কিংবা নির্দিষ্ট সময় পরপর রোগীর শারীরিক পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে পূর্ণ চিকিৎসা শুরু করা হবে কি হবে না, কোন রোগী কোন পদ্ধতির চিকিৎসা থেকে বেশি উপকৃত হবেন, ইত্যাদি বিষয়ে রয়েছে নানাজনের নানা মত। তবে সবাই মনে করেন: রোগ নির্ণয়ের পরে চিকিৎসা শুরুর আগে চিকিৎসা-পদ্ধতি নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রয়োগের সঠিক সময় নির্বাচন অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। এ-বিষয়ে রোগটি কোন পর্যায়ে রয়েছে, রোগের বিস্তৃতি কতটা, রোগ কতটা আক্রমণাত্মক, প্রাথমিক টিউমারের আয়তন কত, রোগীর অন্যান্য রোগের অবস্থা কী, সার্বিকভাবে তার শারীরিক অবস্থা কী, ভবিষ্যতে তার কতটা দীর্ঘায়ু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে।

যদি ক্যান্সার প্রোস্টেট-গ্রন্থির খুবই সামান্য অংশ জুড়ে থাকে (low-volume disease), খুবই হালকা ধরনের হয় (low-grade disease), শরীরের অন্য কোথাও এর বিস্তৃতি লক্ষ করা না-যায়, শারীরিক অন্য কোনো অসুস্থতাজনিত কারণে দীর্ঘায়ু হবার সম্ভাবনা কম থাকে সে-ক্ষেত্রে শুরুতেই বড় ধরনের চিকিৎসায় না-গিয়ে কেবল সতর্কতার সাথে নির্দিষ্ট সময় পরপর রোগীকে পর্যবেক্ষণ ক'রে প্রয়োজনে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নিয়মিত সতর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা শুরু করে নানাভাবে রোগীর উপকার সাধন সম্ভব এবং অতি-চিকিৎসা (over-treatment)-র ঝুঁকি থেকেও রোগীকে নিরাপদ রাখা যায়। এভাবে রোগীকে চিকিৎসার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচানো যেমন সম্ভব, তেমনি অতিরিক্ত চিকিৎসা-ব্যয়ের সম্ভাবনাও কমানো যায়।

একটি বিষয় বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন: ক্যান্সার সাধারণত নিরাময়যোগ্য রোগ নয়, তবে যথাযথ চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ রাখা, কাজকর্ম করার উপযোগী রাখা, প্রায় সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন নিশ্চিত করা সম্ভব।

মুল বিবেচনার বিষয়গুলো হচ্ছে: সম্ভব হলে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করা, প্রোস্টেট ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণে রাখা, জীবনযাপনের গুণগত মান (quality of life) বজায় রাখতে চেষ্টা করা, রোগীর জীবনকে কর্মময় রেখে প্রলম্বিত করতে সাহায্য করা, অর্থাৎ ক্যান্সারের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একে জয় করে অথবা একে সাথে নিয়ে, নিয়ন্ত্রণে রেখে, চিকিৎসায় থেকে, স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত-করা। প্রোস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সুখবর হচ্ছে: এ-রোগ সঠিক সময়ে নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসায় প্রায় সুস্থ থেকে, স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়ে, দীর্ঘায়ু হওয়া সম্ভব। ক্যান্সার নিরাময় এখনও বৈজ্ঞানিকভাবে সবসময় সম্ভব নয়, আর তাই ক্যান্সার হয়েছে ভেবে বিচলিত হয়ে সব আশা ছেড়ে দিয়ে জীবন থেকে যেন রোগী নিজেকে গুটিয়ে না-নেন সে-দিকটা সতর্কতার সাথে মানবিকভাবে দেখাই হচ্ছে একজন চিকিৎসকের প্রধান ও প্রাথমিক দায়িত্ব। ■

# বন্যাজনিত রোগব্যাধি থেকে পরিত্রাণের উপায়

**আইসিডিডিআর,বি-প্রথম আলোর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকের ওপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন**

*[গত সংখ্যার পর]*

**আইসিডিডিআর,বি-র এনভাইরনমেন্টাল মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি-র প্রধান ড. সিরাজুল ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের ওপর তাঁর বক্তব্য রাখেন। বন্যার সময় হোক আর স্বাভাবিক সময়েই হোক ডায়রিয়াজাতীয় রোগ থেকে পরিত্রাণের মূল পন্থাটি হলো বিশুদ্ধ পানি পান করা। পানি বিশুদ্ধিকরণের যেসব প্রচলিত উপায় আছে তার সঙ্গে তুলনা করে তিনি তাঁর নতুন আবিষ্কৃত 'সিরাজ মিক্সার'-এর অধিক কার্যকারিতার কথা তুলে ধরেন এভাবে:**

পানি বিশুদ্ধ করার জন্য আমি কিভাবে আমার সিরাজ মিক্সার তৈরি করেছি এবং সেটা কিভাবে ডায়রিয়াজনিত রোগের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করতে পারে সে-সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে বলবো। ২০০৪ সালের বন্যার সময় আমি কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। ঢাকার কমলাপুরে আমাদের একটা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র আছে। ওখানে ড. আব্দুলাহ ব্রুকস্ কাজ করেন। সেখান থেকে আমরা কিছু পানির নমুনা সংগ্রহ করে তাতে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া পেয়েছি। যখন বন্যা হয় তখন পানিতে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বেশি দেখা যায়। আমরা দেখতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশে কেন এত ডায়রিয়া হয় এবং ডায়রিয়ার জীবাণুটা কোথায় থাকে। আমরা আবিস্কার করেছিলাম, ডায়রিয়ার জীবাণু বেঁচে থাকে একধরনের শ্যাঁওলার ভিতরে–যাকে ইংরেজিতে 'ব্লু গ্রীন অ্যালগী' বলা হয়। এই শ্যাঁওলার চারিদিকে থাকে একধরনের পিচ্ছিল পদার্থ, যার ভিতর ব্যাকটেরিয়া লুকিয়ে থাকে। আমরা ভাবলাম ব্যাকটেরিয়া যেখানে লুকিয়ে থাকে সেই জায়গাটাকে ধ্বংস করতে পারলেই আমরা এই রোগ থেকে রেহাই পাবো। ড. রোনাল্ড রস যখন ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশার ভিতরে আবিস্কার করলেন তখন ডিটিটি দিয়ে মশা নিধন করলেন এবং মশা নিধন করার ফলে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়ে গেলো। তেমনিভাবে, আমরা যখন ডায়রিয়া জীবাণুর উৎসস্থল হিসেবে শ্যাঁওলা পেলাম তখন ভাবলাম ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশার মত আমরা কিভাবে শ্যাঁওলাকে নিধন করবো। ম্যালেরিয়ার মশা ঝোপ-জংগলে, বাড়ির আনাচে-কানাচে থাকে। ওখানে যদি ডিটিটি দিই তাহলে তো মশা মারা যাবে, কিন্তু এই শ্যাঁওলা তো বাংলাদেশের সব নদী, খাল-বিল সব

জায়গাতেই আছে। সুতরাং একটা বিকল্প পথ বের করলাম। আমরা চিন্তা করলাম, আমাদের গ্রামের মেয়েরা পুকুর, খাল-বিল ও নদী থেকে যে পানি আনে তা গৃহস্থালির কাজে এবং খাওয়ার জন্য ব্যবহার করে। ঐ পানিটা যদি আমরা শ্যাঁওলামুক্ত করে দিতে পারি তাহলে এর সাথে যে ডায়রিয়ার জীবাণু লেগে আছে ওটাও আলাদা হয়ে যাবে এবং ঐ ফিল্টার-করা পানিটা যদি মানুষ ব্যবহার করে তাহলে তার ডায়রিয়া হবে না। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি-র ড. রীতা কলওয়েল-এর সাথে একটা কাজ করেছিলাম। ড. কলওয়েল এবং ড. আনোয়ারুল হকের সাথে কাজ করে আমরা মেয়েদের পুরাতন শাড়িকে মাঝখান থেকে কেঁটে দুইভাগ করে একভাগকে আট ভাঁজ করে কলসের মুখে দিয়ে তাদের বলেছিলাম, আপনারা পানিটা ফিল্টার করে সেই পানিটা ব্যবহার করুন। কাজটা মতলবে ড. ইউনুস সাহেবের সাথে আমরা করেছিলাম। তিন বছর পর দেখলাম, ডায়রিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব প্রায় অর্ধেক কমে গেছে। যারা এই শাড়ির ফিল্টার ব্যবহার করে নি তাদের মধ্যে ডায়রিয়ার প্রকোপ কমে নি।

তারপর ২০০৪ সালে যখন বন্যা হলো তখন কমলাপুরে ভীষণ ডায়রিয়া হচ্ছে। ড. আব্দুলাহ ব্রুকস্ বললেন, তুমি একটু পানি কালেকশন করে এনে দেখো না ওখানকার কী অবস্থা। আমরা বন্যা-কবলিত এলাকার বিশ জায়গা থেকে (যার মধ্যে ওয়াসার হ্যান্ড-পাম্প আছে, গাজী ট্যাংক আছে, টেপের পানি আছে) এবং অন্য যত ধরনের খাওয়ার পানির উৎস আছে সব জায়গা থেকে পানি সংগ্রহ করলাম। পানি সংগ্রহ করে এনে তার দূষণের মাত্রা দেখলাম। সব পানিই অতিমাত্রায় দূষিত ছিলো। ৯৫% ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার জীবাণু পাওয়া গেলো। তখন ভীষণভাবে ডায়রিয়া হচ্ছে ওখানে। তখন সেই তথ্যটি আমরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে জানালাম। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বললো আমরা যেন দ্রুত এর একটা সমাধান বের করে দিই। ওখান থেকে পানি আনার পর আমি ঐ পানি নানা ধরনের বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায়, যেমন হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ব্লিচিং পাওডার, ফিটকিরি–এসব দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলাম এবং দেখলাম এসবে কাজ হচ্ছে বটে, তবে পানির পিএইচ কমে গিয়ে এসিডিক হয়ে যাচ্ছে। পানির স্বাভাবিক পিএইচ ৭, কিন্তু এসব প্রয়োগের ফলে তা কমে ৪.৫-এ চলে আসে। ঐ পানি খেলে গলায় যন্ত্রণা হয়। তখন আমরা বিকল্প ভাবনায় মতলবের খাল থেকে প্রতি ১৫ দিন পর পর পানি এনে ল্যাবে পরীক্ষা করতে লাগলাম আরও একটা ভালো পদ্ধতি বের করার জন্য। আমরা দেখতে পেলাম অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ঐ পানিতে আছে এবং প্রচলিত ফিটকিরি ও চুনসহ বিভিন্ন পানি বিশুদ্ধিকরণ রাসায়নিক পদার্থ আলাদা-আলাদাভাবে দিয়ে দেখলাম সঠিকভাবে পানি বিশুদ্ধ করতে পারা যায় কি না।

গোলটেবিল বৈঠকের একাংশ

এরপর কয়েকটি একত্রে যোগ করে দিলাম। যখন শুধু ব্লিচিং পাউডার দিয়ে টেস্ট করেছি তখন পিএইচ একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যখন ফিটকিরি দিচ্ছি তখন ৭ থেকে ৪-এ নেমে আসছে–অর্থাৎ এই পানি খাওয়া যাবে না। আবার যখন শুধু চুন দিচ্ছি তখন পিএইচ ৭-এর বেশি হয়ে পানি ক্ষারীয় হয়ে যাচ্ছে। যখন দুইটা একসাথে দিচ্ছি তখন দেখা যাচ্ছে খুব বেশি কমছে না। কিন্তু যখন ফিটকিরি, ব্লিচিং পাউডার এবং চুন তিনটা একসাথে দিচ্ছি তখন দেখা যাচ্ছে পিএইচ ঠিক থাকছে। এভাবে আমরা আরও গবেষণা করতে থাকলাম। পানির পিএইচের পরিবর্তন এবং টারবিডিটি অর্থাৎ পানি কতটা ঘোলাটে দেখাচ্ছে তা-ও পরীক্ষা করলাম। ঘোলা পানিকে আমরা কিভাবে পরিষ্কার করতে পারি এবং তার ওপর বিভিন্ন উপাদানের কী প্রভাব পড়ে তা পরীক্ষা করা হলো। শুধু ব্লিচিং পাউডার দিলে ঘোলাটে-ভাব ৩৫ থেকে ৩০-এ চলে আসে। যদি শুধু ফিটকিরি দিই তাহলে ৩৫ থেকে ৫-এ নেমে আসে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইনে আছে যে, খাওয়ার পানির ঘোলাটে-ভাব সবসময় ৫-এর নিচে হতে হবে। চুন দিলে এটা কমে না। দুইটা একত্রে দিলে কী অবস্থা হয় তা-ও দেখলাম। কিন্তু যখন তিনটা একসাথে দিচ্ছি তখন আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফল পেলাম। এর নাম দিলাম আমার নামে 'সিরাজ মিক্সার'। এটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখা হলো।

আমরা এই মিক্সার প্রতি সাত দিন পর পর মানুষের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসি এবং ১ বছর ধরে দেখে আসছি: যেসব বাড়িতে আমরা মিক্সার দিচ্ছি ঐসব বাড়ি থেকে কোনো ডায়রিয়া রোগী আসছে কি না। যেসব পরিবারে এই পদ্ধতিতে পানি বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করা হয়েছে সেসব পরিবার থেকে এপর্যন্ত একটা রোগীও আমাদের হাসপাতালে আসে নি। কিন্তু পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলো থেকে ৮৩ জন রোগী আমাদের হাসপাতালে এসেছে। এই পানি ওরা শুধু খাওয়ার জন্যই ব্যবহার করছে এবং দেখা যাচ্ছে যে, মতলবে অনেক টিউবওয়েলে আর্সেনিক আছে, আবার অনেক টিউবওয়েলে আর্সেনিক নেই। যারা ঐ টিউবওয়েলের পানি বাদ দিয়ে সিরাজ মিক্সার দিয়ে পানি বিশুদ্ধ করছে তারা খাওয়ার জন্য ব্যবহার করছে। কারণ এর স্বাদ টিউবওয়েলের পানির চেয়ে ভালো। ২০০৭ সালে যে বন্যা হয়েছে এই বন্যায় আমরা ট্যাপ-এর পানি, টিউবওয়েলের পানি এবং সিরাজ মিক্সার দিয়ে বিশুদ্ধ-করা পানির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেছি। দেখেছি সিরাজ মিক্সার প্রয়োগে এমনসব জীবাণু মারা যাচ্ছে যেগুলো ডায়রিয়া ঘটায়। বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের মাত্রা, স্বচ্ছতা, পিএইচ, স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী বজায় আছে। আমদের মেয়েরা যে-কলসিতে পুকুর বা নদী থেকে পানি আনে এরকম একটা কলসিতে ১৫ লিটার পানি ধরে। তাই আমরা সিরাজ মিক্সার প্রয়োগের পরিমাণ ১৫ লিটার পানির ভিত্তিতে নির্ধারণ করেছি। একটি মিক্সার আধা ঘন্টা দিয়ে রাখলে পাণি সম্পূর্ণভাবে খাওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়ে যায়।

ব্র্যাক তাদের ওখানে সিরাজ মিক্সার-এর ওপর কিছু বলার জন্য আমাকে ডেকেছিলো। এর পর তারা আমার কাছ থেকে ৩০ হাজার সিরাজ মিক্সার কেনার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছেন। এখন এগুলো আমি তৈরি করছি আমাদের ল্যাবরেটরিতে।

**আইসিডিডিআর,বি-র শিশু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ শামস্ এল আরিফীন বলেন:**

ডায়রিয়াতে মৃত্যুর হার এ-দেশে এখন অনেক কমে গেছে। এখন নিউমোনিয়াতে অনেক বেশি রোগী মারা যায় এবং নিউমোনিয়া প্রতিরোধেরও অনেক উপায় আছে। শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোও নিউমোনিয়া প্রতিরোধের একটি উপায়।

এর অনেক ভ্যাকসিন আছে যার মধ্যে কোনোটাই বাংলাদেশে এখনও সরকারিভাবে পাওয়া যায় না। হিব (Hib) ভ্যাকসিন প্রাইভেট কোম্পানীর মধ্যেমে পাওয়া যায় এবং আমরা শুনেছি বাংলাদেশ সরকার হিব ভ্যাকসিন আগামী বছর থেকে টিকাদান কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করার চিন্তা-ভাবনা করছে। নিউমোনিয়াজনিত মৃত্যুহার কমানোর আর একটা উপায় হলো এর যথাযথ চিকিৎসা। চিকিৎসার বেলায় সবচেয়ে বেশি সমস্যা দেখা দেয়। জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, প্রায় চার ভাগের এক ভাগ রোগী কোনো চিকিৎসা নিচ্ছে না। বাকি তিনভাগের মধ্যেও অধিকাংশ রোগী যাচ্ছে অষুধের ফার্মেসীতে কিংবা হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে।

ডায়রিয়ার পরও নিউমোনিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। সেজন্য আমরা প্রস্তুত কি না এই মুহূর্তে সেটা একটা বড় বিষয়। আমাদের সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ-বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

আমরা কাজ করছি নবজাতক এবং ৫ বছরের কম-বয়সী শিশুর মৃত্যুহার কমানোর জন্য। এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার সম্প্রতি একটা সাব-কমিটি করেছে যারা জাতীয় পর্যায়ে নবজাতকের মৃত্যুরোধের জন্য একটি কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করবে এবং কৌশল নির্ধারণ করবে। আমরা আশা করছি, সমন্বিত প্রচেষ্টায় আগামী মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটা কৌশল অবলম্বন করা হবে, যার ওপর ভিত্তি করে আমরা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামতে পারবো। এ-বিষয়ে মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা আছে। গণসচেতনতা তৈরি ও সমন্বয়ের ব্যাপারে মিডিয়া অবদান রাখতে পারে। একটা বড় সমস্যা হলো বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বাংলাদেশে যে তথ্য আছে তা অপ্রতুল। জাতীয় পর্যায়ে একটা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি থাকলে যেখানে শুধু মৃতুহার নয়, কারণগুলোও আমরা জানতে পারতাম কখন কোথায় কী হচ্ছে।

**আইসিডিডিআর,বি-র ইমিউনোলজি ল্যাবরেটরি-র প্রধান ড. ফিরদৌসী কাদরী বলেন:**

বন্যা বা মহামারীর আগেই রোগ প্রতিরোধের উপায় হিসেবে আমি প্রতিষেধকের ওপর গুরুত্ব দিতে চাই। আমি মনে করি, ডায়রিয়াজাতীয় রোগের সংক্রমণ, টাইফয়েড এবং শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ এড়াতে আমাদের আগে থেকেই প্রয়োজনীয় টিকা নিয়ে রাখা উচিত। আমি প্রতিষেধক ব্যবস্থা-বিষয়ক সচেতনতাকে গণস্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করি। আমি দেশেই বিভিন্ন টিকা প্রস্তুত করার ব্যাপারে জোর দিতে চাই, কারণ সেগুলো বিদেশ থেকে আনতে হয় বলে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এ-পর্যায়ে আমি খাবার স্যালাইন এবং জিঙ্ক চিকিৎসার সুফল এবং টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের সফলতার কথা উল্লেখ করতে চাই। বর্তমান ডায়রিয়া পরিস্থিতি থেকে প্রাপ্ত অণুজীব-ভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়: ৮০% রোগ উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থার সাহায্যে প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং এসব টিকা দেশেই উৎপন্ন করে আমাদের জনগণকে এসব রোগ থেকে মুক্ত রাখতে আমরা সক্ষম হবো।

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো-র জনাব মোঃ আবদুর রব বলেন:**

ডাঃ এম এ সালাম তাঁর মূল নিবন্ধে একটা কথা বলেছেন, আমরা প্রতিটি বন্যা থেকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। আমি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো-তে মাঠ-পর্যায়ে প্রশিক্ষক হিসেবেও কাজ করি। আমি দেখেছি, আমরা বন্যা এবং বিভিন্ন দুর্যোগ এলেই খুব তৎপর হয়ে যাই। কিছুদিন পরই সেই অভিজ্ঞতা আমরা আর মনে রাখি না। আমাদের যত অভিজ্ঞতাই থাকুক সেই অভিজ্ঞতা যদি আমরা সময়মতো কাজে না-লাগাই তাহলে কোনো কাজ হবে না। ড. প্রদীপ কুমার বর্ধন ডায়রিয়া এবং খাবার স্যালাইন সম্পর্কে বলেছেন। আমার পর্যবেক্ষণ হলো: খাবার স্যালাইন আমরা বিভিন্ন কোম্পানী বা বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে পাই। আমি মাঝেমধ্যে কিছু খাবার স্যালাইন কিনে ঘরে রাখি। দীর্ঘদিন ব্যবহার না-করার ফলে এর কার্যকারিতা নষ্ট হলো কি না অনেক সময় সেটা জানা যায় না। কারণ প্যাকেটের ওপর কোনো তারিখ লেখা নেই। আশপাশের দোকানগুলোতে যে খাবার স্যালাইন কিনতে পাওয়া যায় তারা হয়তো কিনে রেখেছে দুই বছর আগে। যখনই ডায়রিয়া দেখা দিচ্ছে তখনই এগুলো বিক্রি শুরু করে দিয়েছে। যখন পত্রিকায় খবর বেরুলো খাবার স্যালাইনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে, বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন খুঁজে খুঁজে পুটলার নিচ থেকে হয়তো তিন বছর আগে সংগহ-করা প্যাকেট বের করা হলো। এক্ষেত্রে এগুলো আমি যদি ব্যবহার করি তাহলে তো কাজ হবে বলে মনে হয় না। এ-বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া দরকার।

বিশুদ্ধ পানি পান সম্পর্কে ড. সিরাজুল ইসলাম অনেক কথা বলেছেন। আমরা আমাদের অবগতির জন্য জানতে চাচ্ছি সিরাজ মিক্সার বাজারজাত করা হলে কী পরিমাণে সরবরাহ করা যাবে! কতদিনে আমরা তা পারছি? বিশেষভাবে এটা চরাঞ্চল বা শহরাঞ্চলে যেসব এলাকায় বিশুদ্ধ পানির একেবারেই অভাব সেসব এলাকায় কতদিনে দিতে পারবো? দৈনিক বা মাসিক কী পরিমাণে তা উৎপাদিত হচ্ছে? আমার মনে হয়, এটা এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থায় আছে। আর পুষ্টি সম্পর্কেও অনেক কথা বলা হয়েছে। আমরা বাজার থেকে প্রায় শুকনো খাবার কিনে সেটা খাই ভেজাল তেলে ভেজে। পাকা ফল যা খাই তাতেও ফরমালিন দেওয়া। মাছ যেটা জীবিত পাই সেটাও শহরতলীর নোংরা জলাশয়ে উৎপাদিত মাছ। এ-সম্পর্কে আমাদের জন্য কী পরামর্শ আছে আমিও জানি না এবং আপনারা কতটুকু জানেন তা-ও জানি না। মাঝেমধ্যে পত্রিকায় দেখি, এখন আমরা যে শাক-সব্জি খাচ্ছি তা বন্যার পানিতে ডুবে গিয়েছিলো। আমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখেছি পুঁইশাকের মাথার পাতাগুলো অন্তত একফুট পানির নিচে ছিলো যা কেটে আনা হয়েছে। বন্যার পর যদি গরুকে ঘাস খাওয়ানো হয়, তবে সেই গরুর মড়ক দেখা দেয়। তাহলে এই যে বন্যা-কবলিত পুঁইশাক আমরা খাচ্ছি তাতে মানুষের মড়ক দেখা দিবে কি না! আমি লেখাপড়া-জানা মানুষ, আমি যদি সতর্ক না-হই তাহলে অশিক্ষিত মানুষ কিভাবে সতর্ক হবে? আমার তো ধারণা, বন্যার পরে বা বন্যাকালীন সময়ে কোনো শাক-সব্জিই নিরাপদ নয়–বিশেষভাবে শাক। এটা মানুষকে কিভাবে জানাবো এবং কত তাড়াতাড়ি জানাতে পারবো? বন্যা শেষ হয়ে গেলে জানালে তো কোনো লাভ হবে না। এ-বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় তথ্য দিলে কৃষি বিভাগ নিজেই এর প্রচার করতে পারে, স্বাস্থ্য বিভাগও করতে পারে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো'র আমরা করতে পারি, জেলা প্রশাসন করতে পারে এবং উপজেলা প্রশাসনও করতে পারে।

এটা আমি এই ফোরামে আলোচনা করছি এজন্য যে, প্রথম আলো-র এই উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী। এসব বিষয়ে সরকার অবহিত হোক এজন্য আমি এগুলোর অবতারণা করলাম। বাংলাদেশকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে একেক এলাকার দায়িত্ব একেক সংস্থা বা মন্ত্রণালয়কে দেওয়া যেতে পারে।

আমরা পুনর্বাসনের ব্যাপারে যে-আলোচনা করেছি এটা আসলে খুবই জটিল ব্যাপার। পূর্ব কাজ এবং পুনর্বাসন এই দুইটা আমরা একত্রে গুলিয়ে ফেলি। ঠিক সময়ে ঠিক আলোচনা করাটাই কাম্য।

**আইসিডিডিআর,বি-র নিউট্রিশনাল বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি-র প্রধান জনাব এম এ ওয়াহেদ বলেন:**

বন্যা বাংলাদেশের প্রায় বার্ষিক একটি ঘটনা, আর মানুষের ডায়রিয়া হচ্ছে আদিকাল থেকেই। ওয়াসা এবং টিএন্ডটি রাস্তাঘাটে যে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে তাতে বন্যা এলেই শহরাঞ্চলে পয়ঃপ্রণালী আর বন্যার পানি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, মানুষের অসুখ হয়। শহরের জলাশয়গুলো ভরাট করার ফলে অবস্থা আরো শোচনীয় হচ্ছে। এখানে এই মহাখালিতে ময়মনসিংহ বাসস্ট্যান্ডে কত মিলিয়ন লিটার পানি ধরতো! বারিধারায় যেখানে বাড়ি তৈরির প্রকল্প চলছে সেটা ছিলো বিরাট একটা বিল। এগুলোকে ভরাট করে আমরা শহরে বন্যা ডেকে এনেছি।

এক সাংবাদিক বন্ধু বলেছিলেন খাবার ও অষুধের মজুতের কথা আমরা শুনতে চাই না, শুনতে চাই

বিতরণের কথা। খুবই ভালো একটা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে: খাবার স্যালাইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে তৈরির তারিখ ও কার্যকারিতার মেয়াদকাল সুনির্দিষ্টভাবে প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকা দরকার। আমাদের এখানে যা তৈরি হচ্ছে তাতে ব্যবহারের মেয়াদকাল উল্লেখ আছে। আমার অনুরোধ সব উৎপাদনকারীই যেন তা করেন।

আমাদের দেশে আমি একটা ইন্টরন্যাশনাল স্লোগান সবখানে ছড়িয়ে দিয়েছি: "রাইট টু নো হোয়াট উই ইট" অর্থাৎ আমরা কী খাই তা জানার অধিকার আমাদের আছে। ফরমালিন দিয়ে মাছ তাজা রাখা হয়। শাক-সব্জিতে কেমিক্যাল দিয়ে এগুলো সবুজ রাখা হয়। এর মধ্যেও আমরা বেঁচে আছি। আমরা কেবল ডায়রিয়া দেখছি, পরবর্তী সময়ে টাইফয়েড হবে, লিভারের রোগ হবে, জন্ডিস হবে। এসব রোগে কারো মৃত্যু হলে তা-ও যে বন্যার কারণে হয়েছে তা আর আমরা খতিয়ে দেখবো না। এসব মোকাবেলার জন্য আমাদের এখনই সজাগ থাকতে হবে।

**আইসিডিডিআর,বি-র মতলব উপকেন্দ্রের প্রধান ডাঃ মো: ইউনুস বলেন:**

পুনর্বাসন নিয়ে কথা বলা খুব সহজ হলেও কাজ করাটা খুবই কঠিন। বন্যার মতো দুর্যোগের সময় যত ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয় সবগুলোকে কাটিয়ে ওঠার নামই পূর্ণাঙ্গ অর্থে পুনর্বাসন। এটা শুরু হয় নিজের ঘর থেকে। যার বাড়িতে পানি উঠেছে তিনি নিজের উদ্যোগে ঘরটা ঠিক করবেন, ভাঙা বেড়া মেরামত করবেন, প্রয়োজনে নিজের টিউবওয়েল, পায়খানা, ইত্যাদি মেরামত করবেন। কিন্তু যারা নিজেরা পারছেন না সেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এই সাহায্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, এনজিও কিংবা সামাজিক সংগঠনগুলো থেকে আসে। এর জন্য সমন্বয় দরকার। সমন্বয়টা বিভিন্ন পর্যায়ে করতে হবে। একেবারে ওয়ার্ড পর্যায়ে যেখানে আমাদের জনপ্রতিনিধি আছেন এবং ওয়ার্ড মেম্বার আছেন অথবা ইউনিয়ন কাউন্সিল আছে সেসব পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত থাকতে হবে। এ-বিষয়ে সরকারকেই মূল দায়িত্ব নিতে হবে ।

দেখা গেছে, যেসব জায়গায় সহজে পৌঁছা যায় সেখানেই আমরা ত্রাণকাজের জন্য যাই। দুর্গম এলাকায় কেউ যেতে চায় না। ফলে ত্রাণসামগ্রী বা পুনর্বাসন কার্যক্রমও হয়তো পৌঁছায় না। এগুলো আমাদের ভাবার বিষয়।

সিরাজগঞ্জের যে-ছবি আমরা দেখেছি টেলিভিশনে এগুলো পুনর্বাসনযোগ্য নয়। পুরো গ্রাম একদম নদীর গর্ভে চলে গেছে। একটা পত্রিকায় এসেছে যে, একটা গ্রামের ২০০-৩০০ পরিবারের ঘরবাড়ি একেবারেই নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ওরা কোনোদিনই পুনর্বাসিত হবে না। ওদেরকে চলে আসতে হবে ঢাকা শহরে কিংবা অন্য কোনো শহরে

২০০৭-এর বন্যাকালীন ডায়রিয়া রোগীদের চিকিৎসায় আইসিডিডিআর,বি-র নির্বাহী পরিচালক থেকে শুরু করে কেন্দ্রের সকল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন সদা তৎপর

যেখানে ওরা এসে বস্তিতে এসে শুরু করবে নতুন এক জীবন। মিডিয়া যদি এ-বিষয়গুলোকে বারবার জনসমক্ষে তুলে ধরে তবে পুনর্বাসন কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত সংজ্ঞা ও রূপ লাভ করতে পারে।

**আইসিডিডিআর,বি-র বিজ্ঞানী ড. মনিরুল আলম বন্যার পানির দূষণ থেকে এ-দেশের টিউবওয়লগুলোকে রক্ষা করার উপায় বাতলে দিয়ে বলেন:**

বাংলাদেশে ৮৬ হাজার টিউবওয়েল আছে। টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক থাকুক আর যাই থাকুক ৩০ বছর আর্সেনিকযুক্ত পানি খেলে শরীরে রোগ হয়। কিন্তু বন্যার সময় পানি পাওয়া যায় না। টিউবওয়েলগুলো কেন পানির নিচে যাবে? যে-টিউবওয়েলগুলো পানির নিচে যায় এবং যেসব এলাকায় বন্যা হয় সেগুলো কেন পানির উপরে থাকবে না? সেই টিউবওয়েলগুলোকে পানির উপরে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। কমপক্ষে একটা গ্রামে একটি টিউবওয়েল সরকারি উদ্যোগে উঁচু স্থানে স্থাপন করতে হবে। যখন বন্যা হবে, তখন ঐ টিউবওয়েল মানুষের জন্য পানি সাপ্লাই করতে পারবে। তাহলে পানি বিশুদ্ধিকরণের জন্য আমাদের আর এতকিছু করতে হবে না। ঢাকার চারপাশে বস্তি আছে এবং বস্তিবাসীরা পাইপ দিয়ে চুয়ানো পানি সংগ্রহ করার চেষ্টা করে, যা অনেক সময় ড্রেনের পানি বা বন্যার ময়লা পানির সাথে একাকার হয়ে যায়। এসব এলাকায় আমরা যদি কয়েক হাজার চাপকল বসিয়ে দিই তাহলে পানিতে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া বলে কিছুই থাকবে বলে আমি মনে করি না। চাপকলের কোনো বিকল্প নেই। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে সাঁতরে এসে, নৌকা দিয়ে এসে, ভেলা দিয়ে এসে কলসি ভরে পানি নিয়ে যাবে। আমার মনে হয় এই তথ্যটা প্রথম আলোসহ সব পত্র-পত্রিকা সবাইকে জানিয়ে দিবে। কূয়াও হতে পারে উঁচু জায়গায়। কূয়ার পানিও বিশুদ্ধ যদি বাইরে থেকে ময়লা পানি না-ঢোকে, কারণ তা নিচু স্তরের বালির ভিতর দিয়ে ফিল্টার হয়ে এসে জমা হয়। উঁচু জায়গায় চাপকল বা কূয়া থাকলে পানি বিশুদ্ধিকরণের জন্য অন্য কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না।

**গোলটেবিল বৈঠকের সমন্বয়কারী ড. ইশতিয়াক জামান বলেন:**

আইসিডিডিআর,বি স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার পাশাপাশি প্রতিবছর শুধু এর ঢাকা হাসপাতালেই প্রায় ১,১০,০০০ ডায়রিয়া রোগীকে বলতে গেলে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রতিবছর ৩৫ হাজার রোগীই মারা যেতো যদি আইসিডিডিআর,বি-র চিকিৎসা-সেবা না পেতো। খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও ডায়রিয়া রোগ-ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী অবদানের জন্য এই প্রতিষ্ঠান আজ সারা বিশ্বে পরিচিত। যদিও আমাদের গবেষণা এখন আর কেবল ডায়রিয়া রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তবুও এর কর্মকাণ্ডের অনেকটা জুড়ে রয়েছে ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা। কেবল খাবার স্যালাইন আবিষ্কার করেই সারা বিশ্বে ৪ কোটিরও বেশি মানুষের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ক্ষেত্রে আইসিডিডিআর,বি কেবল বাংলাদেশেই সেবা দিচ্ছে না, মহামারী দেখা দিলে অন্যান্য দেশেও এর চিকিৎসা-সেবা গ্রহণ করতে আমাদের ডাক পড়ে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৯৪ সালে আফ্রিকার গোমা শরণার্থী শিবিরে আমাদের একটি বিশেষ টিম সেবা দিয়েছে। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে মৃত্যুহার ৪৮% থেকে ১%-এ নেমে এসেছিলো আমাদের উন্নত ব্যবস্থাপনার

কারণে। বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে যখন রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায় আমাদের হাসপাতালে তখন স্থান সংকুলান না-হলেও অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে সেবা দিয়ে থাকি। কাউকে বিনা চিকিৎসায় ফিরিয়ে দিই না।

আজ প্রথম আলো ও আইসিডিডিআর,বি-র যৌথ উদ্যোগে যে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হলো এর মাধ্যমে বন্যাকালীন ও বন্যা-উত্তর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আমাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কাছে চলে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সরকারি নানা স্বাস্থ্য কর্মসূচির সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততা বরাবরই অত্যন্ত নিবিড়। এই বন্যার সময় দুর্গত মানুষের সেবায় আমাদের কী করণীয় তার অনেক কিছুই আলোচিত হয়েছে এই গোলটেবিল বৈঠকে। আমি আশা করি প্রথম আলো-র মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষাকারী এসব তথ্য সবার কাছে অচিরেই পৌঁছে যাবে।

**সমাপনী ভাষণে গোলটেবিল বৈঠকের সভাপতি প্রথম আলো-র যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আবদুল কাইয়ুম বলেন:**

আমরা যেখানে বসে আলোচনা করছি তার নিচেই আইসিডিডিআর,বি-র হাসপাতালে অনেক রোগী মূমূর্ষ অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। তাদের জন্যই আমরা আলোচনা করছি। আমি মনে করি আজকের আলোচনাটা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে এবং বিশেষভাবে আমি উল্লেখ করবো ড. প্রদীপ কুমার বর্ধন তার আলোচনায় যা বলেছেন: আমরা যদি ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসা প্রাথমিকভাবে বাড়িতেই শুরু করি তবে অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালে আসারও প্রয়োজন নেই। আমরা এ-সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করবো। আর শিশুদের পুষ্টির ব্যাপারে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ওপর খুব জোর দিতে হবে। তাহলে ডায়রিয়ার ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হয়ে আসবে। ড. তাহমিদ আহমেদ যে-চিত্রটা তুলে ধরেছেন এটা আমরা অনেক সময় ঠিক খেয়াল করি না। বন্যার সময় মানুষ খাবে কী? বন্যার সময় শত-করা ৫০ ভাগ লোকের কোনো কাজ করার সুযোগ নেই। রিলিফ পাচ্ছে না ৭০% লোক। এক মাসের মধ্যে গড়ে ৬ দিন কোনো খাবার পায় না। শতকরা ৩০ ভাগ শিশু তাদের সম্পূরক খাবার পাচ্ছে না। এ-বিষয়গুলোর গভীরে আমরা যাই না, যার জন্য বন্যায় স্বাস্থ্যসমস্যার যে ব্যাপকতা এটা আমরা বুঝতে পারি না। জনস্বাস্থ্যের ওপর বন্যার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কথাও আমরা এতটা বুঝি না। বন্যার সময় আপাতত ডায়রিয়ার চিকিৎসা করে ফেললাম, কিন্তু এটার যে সারা জীবন একটা প্রভাব থাকবে, ছোটদের শরীরবৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার ফলে স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে যাবে এ-বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে। মি. রনজিৎ কুমার বিশ্বাস তাঁর আলোচনায় বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত পুষ্টি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম সচল রাখতে হবে। পুষ্টি কেন্দ্রগুলোও বন্যায় আক্রান্ত হয়। এগুলো অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যায়।

ডাঃ ফাতেমা যা বলেছেন, প্রসূতি মা এবং গর্ভবতী মায়েদের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশু মায়ের দুধ খেলে তার আর পানি খাওয়ার দরকার হয় না। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের আমরা খুব সহজেই ডায়রিয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারি। কারণ সে যদি পানি বা অন্য খাবার না-খায় তাহলে তো তার ডায়রিয়া হওয়ার আশংকা অনেক কমে যায়।

পানি বিশুদ্ধিকরণের জন্য ড. সিরাজুল ইসলাম গবেষণা করে যেটা বের করেছেন তাকে আমি মনে করি একটা বিশ্বমানের মিক্সার। আমরা এর ব্যাপক প্রচার চাই। আমি বছর খানেক আগে ইউনিসেফ-এর একজন নতুন প্রতিনিধির সঙ্গে তাদের ওখানে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন বাংলাদেশ থেকে অনেক কিছুই রপ্তানি করার মতো জিনিস আছে। তবে দু'টি জিনিস সারা বিশ্বেই রপ্তানি করছে ও করবে। তার একটা হচ্ছে খাবার স্যালাইন, আরেকটা হচ্ছে ডায়রিয়া-সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা। আমি মনে করি, এখানে আরেকটা জিনিস যোগ করার আছে, যেটা হয়তো সিরাজ মিক্সার যা নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। দামও খুব কম। মাত্র দুই টাকা দিয়ে পাওয়া যায়। গবেষক বলেছেন যদি জেলা-পর্যায়ে উৎপাদন করা হয় তাহলে হয়তো আরও কম দামে পাওয়া যাবে।

ডাঃ শামস্ এল আরিফীন বলেছেন শিশু স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মসূচির কথা। ড. ইউনুস পুনর্বাসন সম্পর্কে যা বলেছেন এ-বিষয়গুলোও আমরা ভালোমত খেয়াল করি না। বন্যা চলে গেলে আমরা ভুলে যাই যে, এর একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব থেকে যায়। এদিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। ড. ইউনুস আরো বলেছেন পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিজেদের উদ্যোগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেরাই বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চালাবে। আমরা কিছুটা সাহায্য-সহায়তা দিতে পারি মাত্র। আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে নদী-ভাঙন। নদী-ভাঙনে বিপন্ন মানুষের পুনর্বাসনের দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। ড. ফেরদৌসি কাদরী যা বলেছেন এর আলোকে কয়েকটা বিষয় উঠে এসেছে যে, আমরা টিকাদান কর্মসূচির জন্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছি। সেই টিকার সঙ্গে ডায়রিয়া প্রতিরোধক টিকা–যা দেশের বাইরে পাওয়া যায়–তা যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি তাহলে খুব ভালো হয়।

জনাব মোঃ আবদুর রব খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা প্রশ্ন করেছেন, যেমন খাবার স্যালাইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে-যাওয়ার তারিখ অনেক সময় আমরা খেয়ালও করি না। মাত্র কিছুদিন আগে আমাদের একজন ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ জারি করেছেন, উৎপাদনের তারিখ ও ব্যবহারের মেয়াদকাল উল্লেখ না-করে কোনো পণ্য বাজারজাত করা যাবে না। এ-বিষয়ে তিনি অন্তত আমাদের সচেতন করেছেন।

একটা কথা আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, প্রথম আলো একটি পত্রিকা মাত্র। সংবাদ পরিবেশন করা তার মূল কাজ হলেও আমরা সবসময় একটা সামাজিক দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছি, এমনকি এর জন্য একটা 'ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট উইং' আমরা চালু করেছি। এধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে সংবাদ ও মতামত দিয়ে মানুষ এবং সমাজকে আমরা কিছু দিতে পারবো। এ-কাজ আমরা সবসময় করে আসছি। অবশ্য আজ আইসিডিডিআর,বি-তে আমরা এই যে কাজটা করছি এখানে প্রথম আলো-র চেয়েও বেশি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে আইসিডিডিআর,বি। তারা আমাদের কাছে সহযোগিতা চেয়েছে, আমরা দিয়েছি। এখানে আমাদের ভূমিকাটা নগণ্য। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে অন্তত বিভাগীয় পর্যায়ে যদি আমরা এধরনের আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে আমরা মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারবো।

ওয়াহেদ সাহেব একটা খুবই জরুরী সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, শহর এলাকায় যে বন্যা হয় তা মানুষের সৃষ্ট। জলাশয় ভরাট করার ফলে বন্যার পানি সরে যাওয়ার পথ পায় না।

সরকারের আইন আছে জলাশয় ভরাট করা যাবে না, কিন্তু সরকারি জলাশয় ভরাট করে অনেক জায়গায় নির্মাণ কাজ চলছে। ঢাকা শহরেই ১৩টা প্রবহমান খাল ছিলো; সেগুলো ভরাট হয়ে গেছে। আশুলিয়া এলাকায় বিরাট এলাকা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। গুলশান-বারিধারা এলাকায় ঢাকা শহরের পানি নেমে যাওয়ার যে নিচু জায়গা ছিলো তাও এখন আর নেই। এ-বিষয়ে আমাদের জোর প্রচারণা চালাতে হবে।

ড. মনিরুল আলম কিছু মৌলিক চিন্তা আমাদের উপহার দিয়েছেন। উঁচু জায়গায় টিউবওয়েল ও কূয়া তৈরি করলে বন্যা-কবলিত মানুষেরও বিশুদ্ধ পানির অভাব হবে না। তবে এর একটা সমস্যা হলো যে, মাটির উপরিস্থল থেকে পানি ৩৪ ফুটের উপরে উঠতে পারে না। তবে তাঁর আইডিয়াটা চমৎকার। আমার মনে হয়, মিডিয়া এ-বিষয়ে প্রচারণা চালাতে পারে। সত্যিকার অর্থেই এটা উপকারে আসবে।

আইসিডিডিআর,বি-র বিজ্ঞানীগণ যেসব বিষয়ে গবেষণা করছেন তার ফলাফলগুলো মানব কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে এবং ক্রমাগত হতে থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। ■